সরকার বলেছেন, "a government of the rich, by the rich, and for the rich"। তিনি চাইতেন যে এধরনের রাষ্ট্র মুছে যাক। তার স্থানে আসুক গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সরকার। লুই ব্লাঁ ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষের জন্য কর্মসংস্থান রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং কর্মলাভ করাটা প্রত্যেক মানুষের একটি অচ্ছেদ্য অধিকার। মানুষকে তার অধিকারে আশ্বস্ত করতে হলে সরকারকে শিল্প-সংগঠন করতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র তার মৌলিক কর্তব্য থেকে চ্যুত হবে। লুই ব্লাঁ বলেছিলেন যে রাষ্ট্রকে তাঁর নিজস্ব পুঁজি দিয়ে জাতীয় কর্মশালা (national workshop) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই কর্মশালার তদারকি ও পরিচালনা করবে শ্রমিকরা যাতে শেষ পর্যন্ত তাদের শ্রমের ফসল তারা লাভ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মালিক শ্রেণী (employers) উঠে যাবে এবং শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃত্বে আসীন হবে। লুই ব্লাঁর এই মত ছিল সরল ও স্বচ্ছ এবং শ্রমিক কর্মসূচিতে তা গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে একটি সমাজতন্ত্রী দলের জন্ম হয়। এই দল প্রজাতন্ত্র (Republic) বিশ্বাস করত। প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী আরও দুএকটি দল ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে এই দলের পার্থক্য হল এই যে তারা শুধু সরকারের পরিবর্তন চাইত। এই দল চাইত সমাজ পরিবর্তন, সরকার পরিবর্তন এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় মাত্র।

১(খ).৫ সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধিক রচনা

সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের দার্শনিকেরা নানাবিধ গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে প্রায় সমার্থক করে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন পি. লেরুক্স্ (P. Leroux) এবং জে. রেনো (J. Renaud) তাঁদের লেখা **অ্যাসিক্লোপোদি নুভেল** ও অন্যান্য নানা রচনায়। ১৮২৮ সালে ফিলিপ মিশেল বুওনারত্তি 'সমানদের ষড়যন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি **বাবউফের** ধারণাকে সারা ইউরোপীয় মহাদেশে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন বড় লেখক হলেন সেঁ-সিমঁ। তিনি সংহতিবাদী ছিলেন এবং মনে করতেন যে মানুষের সমাজ একটি বিশ্বব্যাপী সংহতির দিকে এগুচ্ছে। এই সংহতিতে খ্রিস্টধর্ম, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি একটি বই লেখেন, তার নাম নুভো **ক্রিস্তিয়ানিজম** (Nouveau Christianisme) বা নতুন খ্রিস্টধর্ম। এই গ্রন্থে তিনি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বসমাজের জন্য নতুন ধর্মের প্রস্তাব করেন। ১৮০৮ সালে শার্ল ফুরিয়ের (Charles Fourier) তাঁর মতামত প্রকাশের জন্য রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **তেওরি দে কাতর মুভমঁ** (Theories des quatre movements)। এছাড়াও ফুরিয়ের আরও গ্রন্থ লিখেছিলেন। ইংল্যান্ডে

প্রান্তলিপি

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে ফ্রাঁসোয়া নোয়েল বাবউফ (Francois Noel Babeuf) ছিলেন সমাজতন্ত্রের 'প্রারম্ভিক বিন্দু'। তিনি ছিলেন সমানদের সমিতির (Societe des Egaux) নেতা। ১৭৯৬ সালে ফ্রান্সে ডিরেক্টরির বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়েছিল। তিনিই ছিলেন তার নায়ক। কার্যকর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রণয়নে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। কারও কারও মতে সমানদের ইশতাহারই (Manifeste des Egaux) হচ্ছে প্রথম সমাজতান্ত্রিক ধারণার দলিল। বাবউফ ও তাঁর অনুগামী ও সমর্থকরা মনে করতেন যে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব একটি যুগপরিবর্তনকারী ঘটনা। তাকে পরিণতির দিকে নিতে হলে ভূমি ও শিল্পের সামাজিকীকরণ দরকার। স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে জানিয়ে ছিলেন যে প্রকৃতির সম্পদকে ভোগ করার পূর্ণ অধিকার মানুষের আছে। তা তাদের স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার মানুষকে ভোগ করতে হবে। তার দারিদ্রর অবসান ঘটাতে হবে। তাকে সমস্ত মানবিক সুখ উপভোগ করতে দেওয়ার অধিকার দিয়ে তার সামাজিক অবস্থানকে নিশ্চিত করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনার ধারা তৈরি করেছিলেন রবার্ট ওয়েন। তিনি মনে করতেন যে মানুষের সামাজিক সংস্কারের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। তবেই মানুষের নৈতিক সংস্কার আনা সম্ভব হবে নচেৎ নয়। তাছাড়া মানুষের যৌথ অস্তিত্ব ও সমবায়িত জীবনের আদর্শকে তিনি তুলে ধরেন। তাঁর এই মতবাদ প্রকাশের জন্য তিনি লিখেছিলেন **নিউ ভিউ অফ্ সোসাইটি** (New View of Society) এবং **রিপোর্ট টু দ্য কাউন্টি অফ্ ল্যানার্ক** (Report to the County of Lanark)। তাঁর আদর্শকে সার্থক করার জন্য তিনি সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, ফুরিয়ের মতো তিনি রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনাকে নিষ্প্রয়োজন ভেবে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর (Nepoleonie Wars) তিনি সরকারের কাছে দুটি আবেদন রেখেছিলেন—এক, কারখানা সংক্রান্ত আইনের দ্বারা শ্রমিকদের রক্ষা করা হোক এবং দুই, গ্রামের সমবায় প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনকল্যাণের ব্যবস্থা করা হোক। এব্যাপারে সরকারের অনাগ্রহ দেখে তিনি আবেদন করেছিলেন মানবদরদী জনসমাজের কাছে। সেখানেও যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে তিনি সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর কাছে যান।

১(খ).৬ পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস

আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম থেকে ইউরোপে সমাজ চেতনার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল এবং তার সঙ্গে বদলাচ্ছিল সমাজতন্ত্রের দর্শন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজাদর্শে স্থায়ী আসন লাভ করতে থাকে। ১৮২০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 'সমাজতন্ত্রী' (Socialist) ও 'সমাজতন্ত্র' (Socialism) শব্দ দুটি তাদের আচ্ছন্নতা কাটাতে পারেনি। কিন্তু ১৮২৫-এর পর থেকেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে এই শব্দ দুটিকে ব্যবহারযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। ১৮৪১ সালে ওয়েন-পন্থীরা সরকারিভাবে এই শব্দদুটিকে গ্রহণ করে। এ সময় থেকে এ ধারণা জমে উঠছিল যে মোটামুটিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর তার রূপান্তর ঘটাতে হবে। সমাজসত্তার অর্থনৈতিক রূপান্তরের কথা নতুন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে **জন লিলবার্ন**-এর (John Lilburne) নেতৃত্বে লেভেলাররাও (Levellers) সম্পত্তির বৈষম্য, একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা জনিত ধন ও প্রতিপত্তির তারতম্যকে ভেঙে ফেলে সমাজে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদকে সমান (Level) করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আবেগ ছিল বেশি, বোধ ছিল আচ্ছন্ন। ফলে বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ শৃঙ্খলার ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে সমস্যা সমাধানের অর্থনৈতিক সূত্রগুলিকে তারা বুঝতে পারেননি। তারা সামাজিক সমস্যার উৎসকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্যার অন্তর্পটে সভ্যতার উত্থান-পতনের মৌল নিয়মগুলিকে তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীরা যখন এলেন তখন সমস্যা শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাতে আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। নতুন যুগে সমাজবিবর্তনের বিজ্ঞানকে যারা বুঝতে চেয়েছিল সেই কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীরা অন্তত এটুকু বুঝেছিল যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর। অতএব জীবন ও কর্মের সংগঠনের জন্য মানুষকে ব্যক্তিগত শক্তির পরিবর্তে সামাজিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে উচ্ছেদ করে সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে। তাহলেই সমাজের রূপান্তর ঘটবে, না হলে নয়। এইভাবে সমাজে ব্যক্তি শক্তির বদলে যুথশক্তির অনিবার্যতার ধারণা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বোধ যে যাকে আমরা সমাজ বলি তা আসলে একটি

বাহ্যিক সত্তা। যার নিগূঢ় অন্তর্পটের অদৃশ্য, পরিচালিকা শক্তি হল অর্থনীতি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এবার এই বোধ পাকাপাকি হতে লাগল যে অর্থনীতিই যেখানে প্রধান সেখানে বস্তুর ভূমিকাই প্রধান—বিমূর্ত মন ও অপার্থিব চৈতন্য সেখানে অপ্রধান। এইভাবে সমাজতন্ত্রের দর্শনে সমাজ শৃঙ্খলাকে কোন অনির্ণীত অলৌকিকের অভিপ্রায় সঞ্জাত না ভেবে বস্তুঘন পৃথিবীর বস্তুকেন্দ্রিক মানবিক সম্পর্কের উপস্থাপনাভিত্তিক ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত হতে লাগল।

কাল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস :

ইউরোপে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি পরিণতি লাভ করেছিল **কাল মার্ক্স** (Karl Marx) ও **ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস**-এর (Friedrich Engels) হাতে। তাঁরা ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদকে উপস্থাপিত করেছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন, শ্রেণী সংঘাতকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি বলে প্রমাণ করেছিলেন এবং দ্বান্দ্বিকতার তিনটি অমোঘ সূত্রকে ইতিহাস ও দর্শনকে বোঝার প্রামাণ্য হাতিয়ার—দর্শনের ভাষায় 'লজিক'—রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মার্ক্স ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ **ডেভিড রিকার্ডো** (David Ricardo) ও অন্যান্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের থেকে **মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি** (Labour Theory of Value) গ্রহণ করেছিলেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হল এই যে কোন দ্রব্যের 'অর্থনৈতিক মূল্য' (economic value) লুকিয়ে আছে 'ঘনীভূত মানবশ্রমের (in 'human labour crystallized')। এই 'ঘনীভূত মানবশ্রম' হল আসলে সেই বস্তুর নির্মাণে শ্রমিক মানব যে শ্রম দিয়েছেন সেই শ্রম। এই তত্ত্বটিকে মার্ক্সের আগে রিকার্ডো এইভাবে বলেছিলেন—কোন দ্রব্যের মূল্য তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আপেক্ষিক শ্রমের উপর নির্ভর করে ('the value of a commodity' depended 'on the relative quantity of labour necessary to its production')। এর থেকে আরও এক পা এগিয়ে রিকার্ডো ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা বললেন যে শ্রমের নিজস্বমূল্য অর্থাৎ মজুরির হার—সেই বস্তুর উৎপাদক শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের সমানুপাতিক ("...the value of labour itself, or the rate of wages, similarly depended upon the cost of the labourer's subsistance"—R.N. Carew

প্রান্তলিপি

হাইনরিশ কার্ল মার্ক্স (Heinrich Karl Marx) [1818-1883] জন্মেছিলেন এশিয়ার রাইন অঞ্চলে ট্রিয়ার (Trier) নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ইহুদী আইনজীবী। তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার একজন রাজকর্মচারী। ঢিলেঢালা জীবনে অভ্যস্ত তাঁর সংসারে একটা শিক্ষার বিভাষ সদা-সর্বদা বিরাজ করত। সংসারের সহজভাব ও আলোকপ্রাপ্ত মন এই নিয়ে মার্ক্স বড় হয়েছিলেন। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করেন। অর্থনীতি তিনি পাঠ করেছিলেন পরে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করার সময়ে। তিনি দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ছিলেন কিন্তু চিন্তায় ছিলেন তাঁর বিপরীত। হেগেল বিশ্বাস করতেন মন আগে, বস্তু পরে। মার্ক্স ঠিক এর বিপরীতটিতেই বিশ্বাস করতেন। ১৮৪৩ সালে মার্ক্স বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেল-এর (১৮২০-১৮১৫) সঙ্গে যিনি এরপর থেকে সারাজীবন তাঁর বন্ধু ছিলেন। এঙ্গেলস একজন বিত্তশালী জার্মান সূতা ব্যবসায়ীর সন্তান ছিলেন এবং কিছুদিন ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাস করে ইংল্যান্ডে শিল্পায়িত নগর সভ্যতার সংকট নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন। তিনি মার্ক্সকে অনেক এবং কিছুদিন ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাস করে ইংল্যান্ডে শিল্পায়িত নগর সভ্যতার সংকট নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন। তিনি মার্ক্সকে অনেক সাহায্য দিয়েছেন। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর মার্ক্স পাকাপাকিভাবে ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। সারা জীবন তিনি অসহনীয় দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের পথ থেকে সরেননি। হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে (Highgate) তাঁরদেহ সমাহিত করা হয়।

Hunt, *The Theory and Practice of Communism*, p.81) কার্ল মার্ক্স এই মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে (Labour Theory of Value) সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য একটি সূত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক নেতা **ফার্ডিনান্ড লাসাল** ও (Ferdinand Lassalle) এই তত্ত্বকে 'মজুরির লৌহ নিয়ম' (Iron Law of Wages) বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মার্ক্স আরও অগ্রসর হয়ে দাবি করলেন যে বস্তুর মূল্য যদি প্রদত্ত শ্রমের উপর নির্ভর করে তবে বস্তুর মূল্য বা মূল্য সঞ্জাত মুনাফা কেন সেই শ্রমিককে দেওয়া হবে না যে শ্রমিক সেই বস্তুর উৎপাদনে নিজের শ্রমদান করেছে? [পঠিতব্য গ্রন্থ Bertrand Russell, Freedom and Organization, p. 129]। মার্ক্স লিখলেন যে প্রত্যেক শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য, অর্থাৎ বেঁচে থাকার উপকরণ উপার্জনের জন্য যেটুকু শ্রম প্রদান তাকে করতে হয় পুঁজিপতি মালিকরা তার অনেক বেশি শ্রম শ্রমিকদের কাছ থেকে আদায় করে নেয় অথচ এইভাবে আত্মসাৎ করা শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য যা শ্রমিকের পাওয়া উচিত তা তাকে দেওয়া হয় না। এইভাবে শ্রমিকরা তাদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম উপকরণ যা না হলে তারা বাঁচবে না, শ্রমের উৎস শ্রমিকের প্রজনন বন্ধ হয়ে যাবে, সেইটুকু পাওয়ার জন্য যে শ্রম, যাকে প্রয়োজনীয় শ্রম (Necessary Labour) বলা হয়, তার মূল্যটুকু সম্বল করে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। শ্রমিকের সমস্ত উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য পুঁজিপতি মালিকরা আত্মসাৎ করে নেয়। এইভাবে পুঁজিবাদে পুঁজিপতিরা ক্রমশ স্ফীত হয়, শ্রমিকরা ক্রমশ নিঃস্ব হয় (The rich becomes riches, the poor becomes poorer)। এইভাবে তৈরি হয় দুটি শ্রেণী—মালিক ও শ্রমিক, শোষক ও শোষিত, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি নিয়ন্ত্রণ করা পুঁজিপতি ও সর্বহারার দল যাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর হারানোর কিছুই থাকে না। এই উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্যকে আত্মসাৎ করে নিয়ে পুঁজিপতির স্ফীত হওয়ার ঘটনাকে নিয়ে যে তত্ত্ব মার্ক্স লিখেছিলেন তাকে **উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব** (Theory of Surplus value) বলা হয়। তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** (Das Capital) নামক গ্রন্থে তিনি এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন।

আজকের দিনে মার্ক্সবাদ বলতে আমরা যে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শনকে বুঝে থাকি তা তিনটি আকড় বিষয়কে নিয়ে গঠিত হয়েছে—(এক) হেগেলের* কাছ থেকে পাওয়া এক দ্বান্দ্বিকতার দর্শন যাকে মার্ক্স তার ভাববাদের খোলস থেকে বার করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের রূপ দিয়েছিলেন যার থেকে পরে নিসৃত হয়েছিল তাঁর দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের বস্তুতত্ত্ব, (দুই) এক রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy) যার দুটি প্রধান বিষয় হল মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Labour Theory of Value and

প্রান্তলিপি

জর্জ উইলহেলম ফ্রিয়েডরিশ হেগেল (George Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831)—একজন জার্মান দার্শনিক যাঁকে 'চরম ভাববাদী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা' ('founder of the school of absolute absolutism) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। হেগেলের পূর্বে এই অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন বিশিষ্ট দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte)। হেগেল মনে করতেন যে মন বস্তুর আগে জড়ের থেকেও প্রাথমিক ও প্রধান হল চৈতন্য। ইতিহাস মানবমনের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বসত্তার অমোঘ প্রকাশ মাত্র। আত্মিক সত্তার অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাথমিকতায় এবং মৌলিকতায় শুধু হেগেল নয়, আরও অনেক দার্শনিকই বিশ্বাস করতেন—যেমন বার্কলে, স্পিনোজা, লাইবনিৎস, কান্ট, ফিক্টে, শেলিং, ব্র্যাড্‌লি এবং ক্রোচে ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে হেগেলই একমাত্র দার্শনিক যিনি মার্ক্সকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে (Theories of the dialectic) তিনি বলেছিলেন যে প্রগতির প্রসার দ্বন্দ্বের মধ্যে, কোন সরলরেখায় নয় কোন ঋজু পথে নয়। মার্ক্স এই সূত্রের অন্তর্নিহিত ভাববাদকে বাদ দিয়ে এই 'লজিক' গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে হেগেল দ্বান্দ্বিকতাকে বিমূর্ত চৈতন্যের প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন সেখানে মার্ক্স বস্তুর পরিমণ্ডলে মানবিক অধিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে প্রথমে বস্তুর সাথে মানুষের এবং পরে মানুষের সাথে মানুষের উদ্বোধনের প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন।

Theory of Surplus value) এবং এই দুটি থেকে নিঃসৃত অন্যান্য সূত্র [এই সূত্রগুলি উপরে আলোচিত হয়েছে], এবং (তিন) রাষ্ট্র ও বিপ্লব তত্ত্ব (A Theory of State and Revolution)। মার্ক্স তাঁর অর্থনীতির তত্ত্ব পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে, তাঁর দ্বান্দ্বিকতার দর্শন পেয়েছিলেন সনাতন গ্রীক দর্শন ও উনিশ শতকের **জার্মান ভাববাদী স্কুল** (German Idealist School) থেকে এবং রাষ্ট্র ও বিপ্লবের ধারণা পেয়েছিলেন ফ্রান্সের বিপ্লবী ইতিহাস থেকে। লেনিন বলেছেন যে এইভাবে মার্ক্স ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধান তিনটি দেশের আদর্শের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে পরিণতি দান করেছিলেন [Marx 'continued and completed the main ideological currents of the nineteenth century belonging to the three most advanced countries of mankind"—*The Teaching of Karl Marx* (1914) (Little Lenin Library), p. 17]

মার্ক্স পুঁজিবাদের প্রসারের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সমাজে যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল তাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে (Theory of Surplus value) তিনি শিল্পায়িত সমাজে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের আগ্রাসনশীল কর্মসূচির মধ্যে যে অপ্রতিরোধ্য ঘটনার আবির্ভাব দেখেছিলেন তাকে তিনি তিনটি সূত্রের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) **পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সূত্র** (The Law of Capitalist accumulation) পুঁজিপতিদের মধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির বাজার দখল, শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে বাজেয়াপ্ত করে তার ফসল ভোগ করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবিরত চলতে থাকে। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধনতন্ত্রকে দেয় তার অন্তর্নিহিত গতি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে প্রত্যেকটি পুঁজিপতির প্রবণতা হচ্ছে তার পুঁজির সঞ্চয় বাড়ানো। কখনো শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে, কখনো অতিরিক্ত উৎপাদন বাজারে মজুত (Dump) করে এবং কখনো কারখানায় শ্রমিক বিতাড়ন করে এবং তার স্থানে মানবিক শ্রম বাঁচানো যায় এ রকম বড় বড় ও আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার চালু করে তারা পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঘনীভবন ঘটায়। তাদের চেষ্টা থাকে ক্রমশ শ্রম-নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজি নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থায় (from labour intensive to capital intensive system of production) উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা পুঁজিপতিরা সংকটে পড়ে। স্থির পুঁজির সঙ্গে চলিত পুঁজির অনুপাত বেড়ে গেলে ('...any increase in the proportion of constant to variable capital is liable to result in a fall in his profits"—R. N. Carew Hunt) পুঁজিপতির লাভ বা মুনাফা কমে যায়। অধিক উৎপাদনের ফলে যোগান বৃদ্ধি পায় পণ্যসামগ্রীর দাম কমে এবং পুঁজিপতিদের উপর আঘাত নেমে আসে। (দুই) **পুঁজির ঘনীভবনের সূত্র** (The Law of the Concentration of Capital)—পুঁজির ঘনীভবন ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ নিয়ম। পুঁজিপতিদের মধ্যে সীমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল হল এই যে দুর্বল পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতার চাপ সহ্য করতে না পেরে হটে যায়, ক্রমশ তাদের অর্থনৈতিক নিঃস্বতা প্রকট হয়, তারা সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল হতে হতে শেষ পর্যন্ত মজুরি উপার্জনকারীর (Wage-earnes) জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। যে পুঁজিপতিরা টিকে থাকে তারা উৎপাদনে, বাজার নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রমিক শোষণে নিজেদের আধিপত্য বাড়ায়। তাদের হাতে পুঁজির ঘনীভবন ঘটে। এইভাবে ব্যর্থ পুঁজিপতিদের ক্রমশ অবসান হওয়ার ফলে সফল পুঁজিপতিদের সংখ্যা কমে। তাদের অবস্থান, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ হয়, একচেটিয়া কর্তৃত্বের (monopoly) আবির্ভাব ঘটে যায়। মার্ক্স লিখেছেন যে "একজন পুঁজিপতি অনেক পুঁজিপতিকে মারে" ("One Capitalist kills many")। সফল পুঁজিপতিরা তখন ট্রাস্ট (Trust–"combination of produces to do away with competition and keep up prices"), কার্টেল (Cartel—"industrial combination for the purpose of regulating prices,

output") ইত্যাদি গঠন করে তাদের পুঁজির বুনিয়াদকে মজবুত করে তাদের লড়বার ক্ষমতা বাড়ায়। (তিন) **ক্রমবর্ধমান দৈন্যের সূত্র** (The Law of Increasing Misery)—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি চালু থাকার জন্য শ্রমিকদের দীনতা বৃদ্ধি পায়। নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচিয়ে রাখতে পুঁজিপতিরা যতই মরিয়া হয় শ্রমিক শোষণ ততই বাড়তে থাকে। হয় শ্রমের উদ্বৃত মূল্যকে আত্মসাৎ করে, না হয় শ্রমনিবিড় (labour intensive) ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ পুঁজিনিবিড় (Capital intensive) অর্থাৎ যন্ত্রনির্ভর ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার মাত্রাকে স্থির রাখার বন্দোবস্ত করে। এতে শ্রমিক দীন থেকে দীনতর হয়, সর্বহারা মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে এবং শেষকালে সমাজ একটা পিরামিডের আকার নেয় যেখানে মাথায় থাকে শীর্ষপর্যায়ের দু-একজন সফল বেপরোয়া, নিরঙ্কুশ পুঁজিপতি, আর নীচে থাকে ক্রমশ বিস্ফারিত হাহাকারে তলিয়ে যাওয়া সর্বহারার দল। এরজন্য কোন একজন পুঁজিপতিকে দায়ী করে লাভ নেই। এটি একটি ব্যবস্থা, একটি প্রক্রিয়া, একটি নিরন্তর চলমান অপ্রতিরোধ্য অর্থনীতি, এক নিরঙ্কুশ সমাজব্যবস্থার যান্ত্রিক প্রসারমাত্র।

যেমন অর্থনীতিতে মার্ক্স মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন ইংরাজ অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে সেই রকম তিনি জার্মান ধ্রুপদি দার্শনিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দর্শনের হাতিয়ার তাঁর লজিক—যা দর্শনের ইতিহাসে **দ্বান্দ্বিকতা** বা *Dialectic* নামে বিখ্যাত।

১(খ).৭ দ্বান্দ্বিকতা কী?

দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিস্তার—এই হল দ্বান্দ্বিকতা (Dialectic)। ভাববাদী জার্মান দার্শনিক হেগেলের কাছে এবং পরবর্তীকালে মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর কাছে দ্বান্দ্বিকতা হল **দুই বিপরীতের মিলনের সূত্র**— ('the theory of the union of opposites')। মার্ক্স তাঁর ক্যাপিটাল ও **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো** (*communist manifesto*) গ্রন্থে, এঙ্গেলস তাঁর **এন্টিডুরিং** (Anti-Duhring) ও **ডায়ালেকটিকস অফ নেচার** (Dialectics of Nature) গ্রন্থে এবং লেনিন তাঁর **নোটস অন হেগেলস্ লজিক** (Notes on Hegel's Logic) গ্রন্থে দ্বান্দ্বিকতার আলোচনা করেছেন।

মার্ক্স হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা বা ডায়ালেকটিকের যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা তিনটি সূত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। (এক) **পরিমাণ থেকে বস্তুর গুণগত পরিবর্তন ও তার বিপরীতের সূত্র** (*The Law of Transformation of Quantity into Quality and vice versa*)—এই নিয়মের দ্বারা পরিমাণের গুণগত রূপান্তর ও তদ্বিপরীতকে বোঝায়। বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে যায় তবে এক সময় তার গুণগত পরিবর্তনেরও সূচনা হয়। এই পরিবর্তন একমুহূর্তে একটি বিন্দুতে এসে হঠাৎ করে হয়। এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের বিন্দুটিকে হেগেল 'নোড' (Node) বলেছেন। জল তাপিত হলে ১০০° সেন্টিগ্রেডে সে হঠাৎ বাষ্প হয় বা তাকে শৈত্যের মধ্যে রাখা হলে ০° সেন্টিগ্রেডে তা হঠাৎ শিলিভূত হয়ে বরফ হয়ে যায়। একটা বিন্দু পর্যন্ত সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও জল জলই থাকে, কিন্তু পরের মুহূর্তে পরের বিন্দুতেই তা বাষ্প বা বরফ হয়। পরিমাণগত পরিবর্তনের এই বিন্দুটি হল নোড (Node)। এর থেকে একটা উল্লম্ফনের সাহায্যে পরিবর্তন ঘটে। এটি হল হেগেলের **উল্লম্ফন তত্ত্ব** (Theory of Leap)। মার্ক্স বলেছেন যে সমাজ জীবনে এই উল্লম্ফনই হল বিপ্লব। যেমন তাপ বা শৈত্যের প্রয়োগে জলের পরিবর্তন হয় সেরকম শক্তিশালী

সমাজদর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ ও অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা নিয়ে অগ্রসর হওয়া রাজনৈতিক দলের প্রভাবে সমাজে পরিবর্তন আনা যায়।

(দুই) **দুই বিপরীতের মিলন সূত্র** (*The Law of the Unity of opposites*) এটি একটি বিপরীতের ঐক্যের নিয়ম। এই নিয়ম স্বীকার করে নেয় যে যে-কোন অবস্থানে ঘটমান বা পুরাঘটিত বাস্তব সত্তা ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে একটি প্রকৃতিগত স্ববিরোধিতা রয়েছে। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যাবে—একটিকে বলা যেতে পারে **থিসিস** (*Thesis*)। যা অস্তিত্বশীল, চলমান, একটি প্রত্যক্ষ অবস্থান ও তার বৈপরীত্য। তাকে বলা যেতে পারে **এন্টিথিসিস** (*Anti-thesis*)। থিসিসের অন্তর্নিহিত সত্য মেলে এন্টিথিসিসের অন্তর্লীন সত্যের সাথে। দুই সত্যের মিলনে জেগে ওঠে এক নতুন কিন্তু পূর্ণ সত্তা যাকে বলা যেতে পারে **সিনথিসিস** (*Synthesis*)। যেমন বিজ্ঞানে ইলেকট্রনের পরা ও অপরা মেরুর মিলন ঘটে ঠিক সেইভাবে সমাজ-জীবনেও যা অস্তিত্বশীল চলমান এবং তার ভেতরে যা পরিবর্তনকামী বিপরীত তা সমন্বয় ঘটে। মার্ক্স বলতেন যে বুর্জোয়া সমাজেও যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম আছে সেখানেও পুঁজিপতিদের সঙ্গে শ্রমিকদের এই বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রম শোষণ না করে বাঁচতে পারে না আর শ্রমিকরাও পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রয় না করে বাঁচতে পারে না। এইভাবে শিল্পায়িত বুর্জোয়া সমাজে দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয় প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকে। (তিন) **অপলোপের অবলোপ তত্ত্ব** (*The Law of the Negation of the Negation*) এই সূত্রের প্রধান কথা হল থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস (বাংলায় বলা হয় প্রস্তাব, বিপ্রস্তাব ও সমন্বয়) হল আসলে বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, থিসিসের ভেতর থেকে তার স্ববিরোধিতার বৈপরীত্য তাকে বাধা দেয়, থিসিস ভেঙে পড়ে। এন্টিথিসিস প্রবল হয়। থিসিসের পর্যায়কে অবলুপ্ত করে এন্টিথিসিস নতুন পর্যায়ের উদ্বোধন ঘটায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেও মুছে যায় সিনথিসিসের আবির্ভাবে। এইভাবে একটি পর্যায়কে অবলুপ্ত করে আত্মপ্রকাশ করে ইতিহাসের নতুন পর্যায়। কিন্তু বিলীয়মান তার বৈধ উপাদান রেখে যায় উদীয়মানের অন্তঃকরণে যাতে নেতির পরে নেতি, অবলোপের পর অবলোপ ঘটলেও ইতিহাসের যোগসূত্র নষ্ট হয় না। এইভাবে ইতিহাসের ধারা চলে, তার কোন পর্যায়ই চিরন্তন হয় না, জীর্ণতার ভগ্নস্তূপকে সরিয়ে চলতে থাকে অবলোপের অবলোপ, নেতির নেতি। ইতিহাস এইভাবে শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় নিঃসীমভাবে ঋণাত্মক (negative), কিন্তু অফুরন্তভাবে দুই বিপরীতের মিলনে চলমান ধনাত্মক (positive)।

উপরে আমরা যা পড়লাম তা হল বস্তুকেন্দ্রিক মানবজীবনের দ্বান্দ্বিকতা যাকে বলা হয় **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ** (*Dialectical materialism*)। মনে রাখতে হবে যে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দ্বান্দ্বিকতা। এই দ্বান্দ্বিকতাতেই তাঁরা জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁদের বস্তুবাদের ধারণা যার থেকে জন্ম নিয়েছিল তাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মার্ক্স তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় একথা স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব, হেগেলের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হেগেলের মতে কোন চিরায়ত শক্তি এবং চিরন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন মূর্ত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তব বলি। বাস্তব জগৎস্রষ্টার বা বিশ্ব-আত্মার (idea) বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু মার্ক্সের দ্বান্দ্বিকতা, মার্ক্স লিখেছেন, বিশ্বাস করে যে বস্তুময় বাস্তবতা যখন মানবচৈতন্যে প্রতিফলিত হয় তখনই আত্মার উদ্ভাস ঘটে। বস্তুময় অস্তিত্বেই আত্মা চিন্ময়। মার্ক্স তাঁর এই বস্তুবাদকে ইতিহাসেও ব্যবহার করেছিলেন। তার থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** (*Historical Materialism*)।

১(খ).৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। আসলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে যখন সমাজের মধ্যে কতগুলি মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখনই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জন্ম হয় [*Historical materialism, or the materialistic interpretation of history, is simply dialectical materialism applied to the particular field of human relations within society"*—R. N. Carew Hunt] **মার্ক্স** তাঁর **ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি** (Critique of Political Economy) গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন যে, যে নীতি সমাজস্থ মানুষের তাবৎ সম্পর্ককে রূপ দেয় তা নিঃসৃত হয় একটি লক্ষ্য থেকে যে লক্ষ্যে সমস্ত মানুষ ধাবিত হয়, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎপাদনই হল সেই লক্ষ্য। এর পরের লক্ষ্য হল উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় অর্থাৎ বণ্টন। মার্ক্স এইভাবে ইতিহাসকে নিয়োজিত করলেন মানব সম্পর্কের দুই বস্তুময় লক্ষ্যে। তাহলে জীবন সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য উৎপাদন ('production of the means to support life') ও তদনুবর্তী বণ্টন ('the exchange of things produced')। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে তার অপার সম্পদ এবং সেই সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও ব্যবহারিক দক্ষতা (labour and practical skill)। তা দিয়ে মানুষ তৈরি করে হাতিয়ার, তার শ্রমের দ্বারা নিষ্পন্ন সামগ্রী। মার্ক্সের ভাষায় এ সমস্ত হল **'উৎপাদক শক্তি'** ('Productive Forces') অর্থাৎ মানুষের সাথে বস্তুর সম্পর্কই হল উৎপাদক শক্তি। বস্তুর পরিমণ্ডলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল **উৎপাদক সম্পর্ক** ('Productive Relation)। **উৎপাদক শক্তির দ্বারা** উৎপাদক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। এইখানেই মার্ক্স তাঁর ইতিহাসতত্ত্বকে বস্তুবাদ ও অর্থনীতিক উপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে উৎপাদক শক্তিই প্রধান। উৎপাদক শক্তির যখন পরিবর্তন হয় তখনই উৎপাদক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়, তার আগে নয়। উৎপাদক শক্তি হল মানব অর্থনীতির বনিয়াদি ঘটনা, তাই অর্থনীতিই হল সমাজ সংগঠনের ভিত—অবতল, মার্ক্সের ভাষায় unterban (substructure), আর বাদবাকি যা আছে আইন, ধর্ম, নৈতিকতা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সব হল সমাজ সংগঠনের উর্ধ্বতল, মার্ক্সের ভাষায় Oberban (superstructure)। অবতল না বদলালে উর্ধ্বতল বদলায় না।

১(খ).৯ শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব

মার্ক্সের মতে অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকা সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। আদিম যুগে প্রকৃতির সমস্ত রসদ, মানুষের তৈরি সমস্ত হাতিয়ার— means of production—মানুষের শ্রমের সমস্ত ফসল—সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ করত সমাজ, প্রকৃতির দান, শ্রমের ফসল সবাই ভাগ করে নিত সমানভাবে। একে মার্ক্সীয় ভাষায় বলা হয় উৎপাদনের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার—জমি ও বস্তুর—সামাজিক অধিকার স্বত্ব (communal ownership of the means of production)। কিন্তু সভ্যতার আদিপর্বে কিছু মানুষ এই অধিকার স্বত্ব দখল করে নিল। তারা হল প্রভু, আর সব মানুষ হল দীন, হীন, অকিঞ্চন। প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন জমি ও রসদ, হাতিয়ার ও সরঞ্জাম হল তার সম্পত্তি। এইভাবে জন্ম হল ব্যক্তি সম্পত্তির (Private property)। যা হল সভ্যতার আদিতম বিকৃতি। আর এই বিকৃতির ফলে সমাজ শোষক শোষিত, মালিক শ্রমিক, অধিকারী ও অনধিকারী (have-s and Have-nots) এই দুই বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। উৎপাদনের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম, জমি ও পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করা আর না করা হয়ে দাঁড়াল একটি নিরিখ যার ভিত্তিতে সমাজ বিভক্ত হল দুই শ্রেণীতে, পাওয়া আর না

পাওয়া শ্রেণী যারা দাঁড়াল মুখোমুখি একে অন্যের বিরোধী শক্তি হিসাবে, সতত দ্বন্দ্বময়, নিরঙ্কুশ লড়াইয়ের বিরতিহীন অংশগ্রহণকারী দুটি যুযুধান মানবগোষ্ঠী রূপে। এইভাবে সমাজ আপসহীন বিরোধের (irreconcilable contradiction) মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হল। এর পর থেকে সমাজের লক্ষ্য হল একটাই—শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের আদি বিকৃতিকে উচ্ছেদ করে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা করা।

মার্ক্স ১৮৪৮ সালে তাঁর **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** (*Communist Manifesto*) গ্রন্থে এই শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এটি কোন গ্রন্থ নয়, একটি পুস্তিকামাত্র যা একটি মহাদেশীয় বিপ্লবের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল। এই পুস্তিকায় বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান ও বিস্তারের প্রেক্ষিতে বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতি ও শ্রেণী সংগ্রামের ঘনীভবনের কথা বলা আছে। এই পুস্তিকার প্রথম বাক্যটি মার্ক্সবাদের অমর উক্তি : **"এ-যাবৎ কালের সমস্ত প্রচলিত সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস"** ['The history of all hitherto existing society is the history of class struggles']। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর কাছে শ্রেণীই হল ইতিহাসের একক, জাতি নয়। কান্ট, ফিক্‌টে, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকরা জাতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে ইতিহাস পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রের অঙ্গনে জাতিসত্তার মধ্য দিয়ে। হেগেলের মতে ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি হল **'ভাব'** (Idea) যা আসলে একটি বিশ্বসত্তা (Universal spirit')। বিমূর্ত ভাব জাতিতে মূর্ত হয়। মার্ক্স বললেন ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি অর্থনীতি, তার রূপ দ্বান্দ্বিক, তার বিষয় সংঘাত ও দ্বন্দ্ব, তার গতি ঊর্ধ্বমুখী ও ঘূর্ণায়মান (Spiral) এবং তার লক্ষ্য চিরন্তনভাবে এক, শোষককে ধ্বংস করে শোষিতকে মুক্ত করা। এই লক্ষ্যে দরকার হয় আদর্শ (ideology) ও সংগঠন বা দল (party)। এ লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ একটাই, শ্রেণী সংগ্রাম। তাই শ্রেণী সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য (irresistible) এবং অপ্রত্যাবর্তনীয় (irreversible)। মার্ক্স বলেছেন যে প্রত্যেকমানুষই জন্মায় এক একটি শ্রেণীর মধ্যে, বড় হয়ে সেই শ্রেণীর পরিমণ্ডলে, তার চৈতন্যে বিধৃত থাকে সেই শ্রেণীরই সংস্কৃতি। ইতিহাসের লক্ষ্য আর চলমানতার মধ্যে রয়েছে এক অনির্দেশ্য অনিবার্যতা (Inevitibility) এবং অবধারিত প্রাক্‌নির্ণয়তা (Predeterminism)। প্রত্যেক মানুষের শ্রেণীর ভেতর যে অবস্থান তা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ, প্রাক্‌নির্ণীত। ইতিহাসের লক্ষ্য স্থির, অতীত থেকে বয়ে আনা পরম্পরাগতভাবে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াইয়ের পদ্ধতিও স্থির দ্বান্দ্বিক। এর রূপও আবহমান কালের ধারাবাহিকতায় নিশ্চিত শ্রেণী সংগ্রাম। এর কালান্তরের উদ্দেশ্যও এক এবং অমোঘ, ইতিহাসের আদিম বিকৃতিকে মুছে দিয়ে প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভের দিকে যাওয়া, শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করা যে সমাজে ব্যক্তি সম্পত্তির বিসর্জন ঘটবে, উৎপাদনের সমস্ত রসদ ও হাতিয়ার সমস্ত সমাজের হাতে থাকবে। এঙ্গেলস প্রথম তাঁর এন্টিডুরিং-এ বলেছেন যে এইটিই হবে সেই আদর্শ পরিবেশ যেখানে মানুষের উপর মানুষের শাসন মুছে গিয়ে সেখানে আসবে বস্তুর উপর মানুষের প্রশাসন। এই শ্রেণীহীন সমাজই হবে সমাজতন্ত্রের (Socialism) প্রথম পর্যায়। এর পর রাষ্ট্রও আস্তে আস্তে মুছে যাবে (the state will wither away)। মানুষ বাস করবে মুক্ত দুনিয়ায়। মার্ক্স বলেছেন যে এ যাবৎকাল পর্যন্ত চার রকমের উৎপাদন ব্যবস্থা দেখা গেছে। আর রাষ্ট্রের রূপও তৈরি হয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে। এগুলি হল আদিম-সামাজিক (primitive-communal), দাস-নির্ভর (slave), সামন্ততান্ত্রিক (feudal), পুঁজিবাদী (Capitalist)। আরেকটি ব্যবস্থা আছে প্রত্যাসন্ন—সমাজতান্ত্রিক (socialist)। প্রথম ব্যবস্থায় উৎপাদনের মাধ্যমগুলি (means of production) নিয়ন্ত্রণ করত কোন ব্যক্তি নয়, সমাজ। দ্বিতীয়টিতে নিয়ন্ত্রণ করত দাসের মালিকরা (slave-owners)। তৃতীয়টিতে সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রভুরা তা নিয়ন্ত্রণ করত। আর চতুর্থটিতে যা বর্তমান ও চলমান— তাতে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও শ্রম, জমি ও রসদ নিয়ন্ত্রণ করে

পুঁজিপতিরা যাদের মার্ক্স বুর্জোয়া (bourgeoisie) বলেছেন। এদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে প্রলেটারিয়াতরা (proletariat) যারা নিঃস্ব, যাদের শ্রম ছাড়া আর কোন রসদ নেই যা দিয়ে তারা বাঁচতে পারে। সারা পৃথিবীর নিঃস্ব শ্রমিকরা একই শ্রেণীভুক্ত, তাদের ঐক্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে নতুন পৃথিবী গড়ার সম্ভাবনা। তাই মার্ক্স ডাক দিয়েছিলেন 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ('Workers of the world unite')। বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা শোষণের যে যুগ কায়েম করেছে তা শ্রেণীবিভক্ত ইতিহাসের শেষ যুগ, বিকৃত ইতিহাসের সমাপ্তির আগের যুগ (penultimate stage of history)। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুই বিপরীত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব শেষ হবে কোন আপোষে নয়—বুর্জোয়ার পতনে, পুঁজিবাদের অবসানে, প্রলেতারিয়তের একনায়কত্বের (Dictatorship of the proletariat) উত্থানে। এই একনায়কত্বের উত্থান, তার মধ্য দিয়ে শোষণের অবসান ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রশমন—এ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে জাগবে স্বাধীন মানুষের বেঁচে থাকার মুক্ত অঙ্গীকার। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ইতিহাস হয়ে থাকবে দুই বিপরীতের চলমান ভারসাম্য।

১(খ).১০ ইউরোপ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা এক ছিল না। ইংল্যান্ডের জনচেতনায় বিপ্লবমুখিনতার অভাব ছিল কারণ সেখানে ক্রমাগত সংস্কারের (reforms) মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণের চেষ্টা চলত। ফ্রান্সের রাজতান্ত্রিক সরকার সংস্কারবিমুখ ছিল বলে বারবার সেখানে বিপ্লব হয়েছে, আর প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রথমবার হয়েছে আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বিপ্লব চলার সময়ে (১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সম্রাট হওয়ার সময়ের মধ্যে), দ্বিতীয়বার হয়েছে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর (১৮৪৮-১৮৫২) এবং তৃতীয়বার হয়েছে ১৮৭০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানির (প্রাশিয়া) কাছে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর। প্যারিস ছিল ফ্রান্স তথা ইউরোপের বিপ্লবের কেন্দ্রস্থান। জার্মানি অপরাভূত রাজতন্ত্র অখণ্ড দাপট নিয়ে রাজ্যপাট চালাত। ফলে সেখানেও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল। আর রাশিয়ার জারতন্ত্রের নির্মম শাসনে সেখানকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সেখানে বিপ্লব এসেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে (১৯০৫ সালে) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়ে (১৯১৭ সালে)। সাধারণভাবে শিল্প-বিপ্লব ছাড়াও প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা ছিল যার উপর ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে ইউরোপে পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তন-বিরোধী শক্তির মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলছিল। এই সংগ্রামে ক্রমশ একটা দ্বান্দ্বিক রূপ নিচ্ছিল। একদিকে প্রতিক্রিয়ার দমন-নিপীড়ন অন্যদিকে বিপ্লবের উত্থান এই দুই-বিপরীতের মধ্য থেকে ইতিহাস তার রাস্তা করে নিচ্ছিল। ১৭৮৯ সালের পর ইউরোপের ইতিহাসের রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতা—পরিবর্তনের দাবি ও অপরিবর্তনীয় স্থবিরতার সংগ্রাম—১৮৪৮ সালে একটি শিখরে পৌঁছাল। মনে রাখতে হবে যে ১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ইউরোপের যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল তার থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিল জাতীয়তাবাদ ও উদারপন্থা। আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শিল্প-বিপ্লবের আপাত জৌলুসের অন্তরালে সঞ্চিত হিংস্রতা থেকে জন্ম নিচ্ছিল সমাজবাদ। আলোড়িত হচ্ছিল কৃষক-কারিগর শ্রমজীবী মানুষ। ফরাসী বিপ্লব যে প্রগতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল সমাজবাদ তার থেকে এগিয়ে যেতে চাইল। ফরাসী বিপ্লব সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল, চার্চের ক্ষমতাকে খর্ব করেছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ার ক্ষমতাকে কায়েম করেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর সাম্য বুর্জোয়া চেয়েছিল এবং

পেয়েওছিল। এবার সমাজবাদের প্রবক্তারা চাইল অর্থনৈতিক সাম্য ও পীড়িত দলিত স্খলিত মানুষের জন্য ক্ষমতা। দীর্ঘদিন ধরে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে বিশেষ করে রিফর্মেশনের প্রভাবে এবং পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধিত্বের উত্থানে সেখানে চার্চের, রাজতন্ত্রের এবং অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতাকে খর্ব করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে শাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল সংস্কারের কর্মসূচি ফলে যে ধরনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ফ্রান্স, জার্মানিতে বা রাশিয়ায় হয়েছিল সে ধরনের আন্দোলন ইংল্যান্ডে হয়নি। ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়াতেও সমাজবাদী আন্দোলনের প্যাটার্ন এক ছিল না। তা কীরকম ছিল তা এবার আমরা আলোচনা করব।

ইংল্যান্ড : যেভাবে ফ্রান্সে, জার্মানিতে এবং পরবর্তীকালে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল সেভাবে ইংল্যান্ডে কখনো সে আন্দোলন দেখা দেয়নি। সেখানে আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে ওয়েনবাদ অর্থাৎ রবার্ট ওয়েনের মতবাদকে কেন্দ্র করে সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দিকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা সনদবাদী (Chartist) আন্দোলনের রূপ নেয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যে বৃহদায়তন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং নিশ্ছিদ্র শ্রমিক শোষণের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েন তার সমালোচনা করেন। তিনি যে কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মকেও নিন্দা করেছিলেন কারণ ধর্ম মানুষকে শেখায় যে তার মন্দভাগ্যের জন্য সেই দায়ী, মন্দ পরিপার্শ্বের কথা তাকে বুঝতে দেয় না। সেইজন্য ওয়েন মানুষের নৈতিক সংস্কার নয়, সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হন। তিনি মানুষকে প্রতিযোগিতার পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন কারণ প্রতিযোগিতা মানুষকে শোষণের পথে নিয়ে যায়। ওয়েন চেয়েছিলেন সমবায় আন্দোলন—যৌথ জীবন, যৌথ শ্রমদান ও যৌথভাবে শ্রমের ফসল ভোগের পরিকল্পনায় সমবায়িত জীবন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমবায়িত গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রমিকরা ওয়েনের মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হতে শুরু করলে ইংল্যান্ডে একটি নতুন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে ওয়েন একজন শ্রমিকনেতায় পরিণত হন। ইংল্যান্ডে একটা বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিক মুক্তি। আন্দোলনকারীরা একথা বিশ্বাস করতে যে সমবায়ী উৎপাদক সমিতি ও শ্রম কেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মুক্তি আসবে। শ্রমিকরা গড়ে তুলতে পারবে শ্রমবিনিময় কেন্দ্র যা শ্রমসময়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় ঘটবে। শ্রমিক ও সমচিন্তার মানুষদের নিয়ে ওয়েন গড়ে তুলেছিলেন গিল্ড অফ বিল্ডার্স (*Guild of Builders*) এর মতো বৃহৎ জাতীয় সঙ্ঘ। আশা ছিল এরকম সঙ্ঘ শিল্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ভার হাতে তুলে নিয়ে পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দেবে। ওয়েনের এই স্বপ্ন সার্থক হয়নি, শ্রমিকদের এ আন্দোলনও বেশিদূর এগুতে পারেনি। ১৮৩৪ সালে এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে ওয়েনবাদী আন্দোলন গ্রাম-সমবায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ থেকেই ওয়েনবাদের অবসান হতে থাকে।

ওয়েনবাদী আন্দোলন শেষ হওয়ার পর ইংল্যান্ডে আত্মপ্রকাশ করে সনদবাদী (chartist) আন্দোলন। এই আন্দোলন ১৮৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আরম্ভ হয়। হুইগ (whig) সরকারের ব্যর্থতার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর হতাশা ও ক্ষোভ থেকে এই আন্দোলনের জন্ম হয়। রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে যে এইটিই প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন। এইটিই প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলে একেই ইংল্যান্ডে শ্রমিক দলের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে। এই সংগঠনের শাখা ছিল ইংল্যান্ডের সব জায়গায়, এমনকী আয়ারল্যান্ডেও। এর লক্ষ্য ছিল সংসদীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে শ্রমিক দল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে

আসতে পারে ["with branches all over Britain, including Ireland, it aimed to change the parliamentary system so that the working classes would be in control"–*Mastering Modern British History*, Norman Lowe, p.65]। সনদবাদীরা (The chartists) একটি ছয়দফা দাবি সনদ তৈরি করেছিল। একে বলা হত **জনগণের সনদ** (People's charter) ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৮ সালে তিনবার পার্লামেন্টের কাছে আবেদনের (petition) আকারে এই দাবি পেশ করা হয়েছিল। দশ লক্ষের অধিক মানুষ এই আবেদনে স্বাক্ষর করেছিল। তিনবার হাউস অফ কমন্স-এর সভায় তা বাতিল হয়ে যায়। প্রত্যেকবার বাতিলের পর ইংল্যান্ডে দাঙাগ শুরু হয়ে যেত। ১৮৪৮ সালের তৃতীয়বার বাতিল হওয়ার পর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সনদবাদী আন্দোলনের (The Chartist Movement) উদ্ভব হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দা থেকে। ১৮৩৪-এর দরিদ্রের আইন (Poor Law) থেকে যে দুর্গতির সূচনা হয়েছিল তা গড়িয়ে ছিল চল্লিশের দশক পর্যন্ত। একদিকে শিল্পের মন্দা আর অন্যদিকে খাদ্যাভাব সব মিলিয়ে 'ক্ষুধার্ত চল্লিশের দশক' ছিল ভয়াবহ। এই ভয়াবহতার মধ্যে সনদবাদের (chartism) বিকাশ ও ব্যর্থতা যদিও তার সূচনা হয়েছিল তিরিশের দশকের মাঝামাঝি। সনদবাদী বিদ্রোহ হল ক্ষুধার বিদ্রোহ। তার কোন তাত্ত্বিকভিত্তি ছিল না, ছিল না অর্থনৈতিক কর্মসূচি। ফলে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

ফ্রান্স : ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে **লুইফিলিপ**-এর (Louis Philippe) রাজত্বকালে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ফ্রান্সে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের অর্ন্তনিহিত পরিবর্তনের যে ধারা তা একটা সীমার মধ্যে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে গণতান্ত্রিক পথে প্রবাহিত করার কোন বাসনা বুর্জোয়া শ্রেণী দেখাতে পারেনি। ফলে খুব সহজেই নেপোলিয়নের পতনের পর পুরানো ব্যবস্থা ফিরে এসেছিল। এ ব্যবস্থা ছিল রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা যতই শক্তিশালী হোক শেষ পর্যন্ত তা ছিল রাজতান্ত্রিক। ফরাসী বিপ্লব রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ফিরে আসা রাজতন্ত্র মানুষের মনের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে নিজের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

১৭৮৯ সালে বিপ্লবের সময়ে জনগণ মনে করেছিল যে রাজার চরম ক্ষমতা (absolute power) এবং অভিজাততন্ত্রের অফুরন্ত সুবিধা (privilege) ও অধিকার ধ্বংস করা যায় তবে জনগণের মঙ্গল হবে। তাদের এ আশা আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। ১৮১৫ সালে দেশে শান্তি ফেরার সময় থেকে নতুন করে শিল্পায়ন দেখা দিয়েছিল। এই শিল্পায়ন ইংল্যান্ডে এসেছিল আঠারো শতাব্দীতে। এবার ফ্রান্সে এল উনিশ শতাব্দীতে যখন ফ্রান্সের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নির্মম রক্ষণশীলতা কাজ করছিল। এরই মধ্যে এল ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ইংল্যান্ডে যে দুর্গতি এনেছিল ফ্রান্সেও নিয়ে এল সেই দুর্গতি—শ্রমিক শোষণ ও বেকারি, নিঃস্ব মানুষের ঘিঞ্জিবসতি এবং সুষ্ঠু সাফাই (sanitary) ব্যবস্থার অভাবে রোগ ও মারী। এর সাথে এল পরিকল্পিত শ্রমিক শোষণ—ন্যূনতম মজুরিপ্রদান, দিনে রাতের দীর্ঘসময় বাধ্যতামূলক শ্রমদান, শিশুশ্রমিক নিয়োগ, মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরি ইত্যাদি। এই কষ্টের থেকে মানুষদের মধ্যে এই বোধ জন্মাতে লাগল যে শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবই যথেষ্ট নয়, সমাজকে বদলে দিতে না পারলে জনগণের দুঃখ দুর্দশা কমবে না। যাতে সমাজের সমস্ত লাভ ও সমস্ত সুবিধা মুষ্টিমেয়র হাতে না যায়। যে কোন সমাজতান্ত্রিক দর্শনের এইটিই ছিল মূল কথা। ফ্রান্সে এই দর্শনের মূল প্রবক্তা ছিলেন লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)। তিনিই প্রথম অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রের উচিত কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে কর্মহীন মানুষ কাজ পাবে আর তার কাজের পরিশ্রমিক তাকে

মিটিয়ে দেবে রাষ্ট্র। এইভাবে শ্রমজীবী মানুষই কর্মশালাকে (workshop) গুছিয়ে রাখবে, তার তত্ত্বাবধান করবে এবং তার লাভ সমানভাবে ভাগ করে নেবে। এইভাবে তিনি মনে করতেন ব্যক্তি মালিকরা যারা গরীবের শ্রমে ফুলে উঠছে তারা মুছে যাবে। ['...Louis Blanc who in 1839 published a pamphlet called *The Organization of Labour*....claimed that every man had the right to work and that the state should organize workshops where every unemployed man could find work for which he was to be paid by the state. The workpeople were to manage the workshops and share the profits : in this way, he claimed, the private employer, waxing rich on the labour of the poor, would disappear"—S. Reed Brett, *Modern Europe, 1789-1939,* p. 134]

লুই ব্লাঁকে ফ্রান্সের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী বলা যাবে না—তাঁর কাজই ফ্রান্সের প্রথম সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ছিল না। ১৮৩১ সালে ফ্রান্সের অন্তর্গত লাইয়ঁর তাঁতিরা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহই ফরাসী প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রারম্ভিক বিন্দু। লুই-ব্লঁ-র থেকেও অনেক বেশি বিপ্লবী মানুষ ছিলেন **লুই ওগুস্ত ব্লাঁকি** (*Louis Auguste Blanqui–1805-81*)। ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিনবাদের দ্বারা (Jacobinism) প্রভাবিত হয়েছিল লুই ব্লাঁকির বিপ্লবীদল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দল যিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন **বাবউফ** (Babeuf 1760-1797)। বাবউফ ঘোষণা করেছিলেন যে 'প্রকৃতি তার সমস্ত সম্পদকে ভোগ করার অধিকার প্রত্যেক মানুষকেই দিয়েছে' (Nature has granted to every man the equal right to enjoy all her goods') ব্লাঁকি ও তাঁর দলের উপর বাবউফের প্রভাব ছিল গভীর। ব্লাঁকি গোপন তৎপরতা পছন্দ করতেন এবং বিপ্লব শুধুমাত্র আত্মনিবেদিত পেশাদারী বিপ্লবী রাজনীতিবিদদের কাজ একথা বলে তিনি এবিষয়ে লেনিনের উত্তরসূরি হয়েছিলেন বাবউফের একজন সক্রিয় শিষ্য **ফিলিপো বুওনারেত্তির** (*Filippo Buonarroti*—তিনি ছিলেন মিকেলেঞ্জেলোর বংশধর) সংস্পর্শে এসে তাঁর মাধ্যমে **কার্বোনারি** (carbonari) নামে এক ইতালীয় গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেও গুপ্ত সমিতি গড়েছিলেন। কিন্তু এই গুপ্ত সমিতিগুলির কোন জনসংযোগ ছিল না। ফলে ১৮৩৯ সালে গুপ্ত সমিতির দ্বারা অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার ফলে ব্লাঁকি ৪০ বছরেরও বেশি তাঁর অবশিষ্ট জীবন কারাগারে কাটান। ১৮৮১ সালে কারাগারের বাইরে মুক্ত মানুষরূপে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্লাঁকির চিন্তায় দুটি দিক ছিল যা একদিকে ফরাসী সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতাকে সূচিত করে এবং অন্যদিকে যা রুশ সমাজতন্ত্রের উপর প্রভাববিস্তার করেছিল। ব্লাঁকির কোন বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ছিল না। তিনি ট্রেড ইউনিয়নে বিশ্বাস করতেন না এবং সমাজব্যবস্থার সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে চাইতেন আর বিশ্বাস করতেন যে ধর্মকে ধ্বংস না করলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। এরকম বোধ প্রায় নৈরাজ্যের (anarchism) চর্চামাত্র। এর থেকে সমাজতন্ত্রের সুষ্ঠু, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবভিত্তিক কোন কর্মসূচি গড়ে উঠতে পারে না। অন্যদিকে ব্লাঁকির কর্মতৎপরতার মধ্যে যে গোপনীয়তা, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা ও পেশাদারী বিপ্লবীয়ানার ছাপ ছিল তা পরবর্তী কালে লেনিন ও রুশ সমাজতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছিল।

লুই ফিলিপের রাজত্বকালে সমাজতন্ত্রে আস্থাবান ফরাসী জনগণ অনেক বেশি অনুসরণ করত লুই ব্লাঁকে এবং তার সাথে হয়তো বা **পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁকে** (Pierre Joseph Proudhon)। প্রুধোঁ ছিলেন প্রকৃত অর্থে নৈরাজ্যবাদী যদিও তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে চিহ্নিত করতেন। লুই ব্লাঁ ছিলেন ফ্রান্সের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট মতবাদের প্রকৃত প্রবর্তক। ফরাসী সমাজতন্ত্রের বিবর্তনে তাঁর অবদান অনন্য সাধারণ।

জার্মানি : জার্মানিতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করেন **ফার্ডিনান্ড লাসাল** (*Ferdinand Lassalle*)। তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভা, বাগ্মীতা আর কর্মকুশলতার জন্য সমাজতান্ত্রিক দল জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত প্রসারলাভ করে। ১৮৪৮ সালে মার্ক্স যখন কোলনে (Cologne) **ন্যু রেইর্নিশ জাইতুং** (Neue Rheinische Zeitung) নামে সরকার বিরোধী পত্রিকার সম্পাদনা করছিলেন তখন তিনি মার্ক্সের সঙ্গে যুক্ত হন। পরের বছরই অতিবিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং এর পরের দশ বছর মার্ক্সের সঙ্গে আর তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। ১৮৬৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর লাসাল-সৃষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব গিয়ে পড়ে **জোহান ফন সোইৎসারের** (Johann von Schweitzer) উপর। ১৮৬৩ সালে লাইপজিগ (Leipzig) শহরে **আরবেইটারবুন্দ** (Arbeiterbund) নামে আরেকটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের জন্ম হয়। মার্ক্সের শিষ্য **আগস্ট বেবেল** (August Bebel) এবং **উইলহেলম লাইবনেক্ট** (Wilhelm Leibnecht) এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে সরকার বিরোধী পত্রিকা সম্পাদনা করার জন্য মার্ক্স সরকারের রোষে পতিত হন এবং জার্মানি ত্যাগ করে প্যারিসে গমন করেন। সেখানেও সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে উস্কানি দেবার জন্য তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং শেষ পর্যন্ত প্যারিস ত্যাগ করে প্রথমে ব্রাসেলসে এবং পরে লন্ডনে বাসবাস করতে থাকেন। এরফলে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মার্ক্স বড় কোন ভূমিকা নিতে পারেননি।

আরবেইটারবুন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ১৯৬৮ সালে এই সংগঠন **ইন্টারন্যাশনালের** সাথে নিজের যোগ স্থাপন করে। এই শেষোক্ত সংস্থার পুরো নাম **ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারকিং মেনস্ এসোসিয়েশন** (*International Working Man's Association*)। ইতিহাসে তা **প্রথম ইন্টারন্যাশনাল** বা আন্তর্জাতিক নামে (First International) বিখ্যাত হয়। মার্ক্স এই সংগঠন তৈরি করেছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন যে নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকরা এক হবে এবং তাদের হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যকে চরিতার্থ করার জন্য তিনি এই সংগঠন তৈরি করেন।

১৮৬৯ সালে আরবেইটারবুন্দ তার নাম বদলে নিজেকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে পরিণত করে। তখন তার নাম হয় **সোজিয়ালডেমোক্র্যাটিশ আরবেইটার পারটেই** (*Sozialdmokratische Arbeiterpartei*)। যেহেতু আইসেন্যাক (Eisenach) নামক স্থানে পার্টি কংগ্রেসে এই নাম পরিবর্তন হয়েছিল বলে এর সদস্যদের বলা হত **আইসেন্যাকার্স** (Eisenachers)। এদের বিপরীত ছিল লাসালের দল। তাদের বলা হত **লাসালিয়ানস্** (*Lassalleans*)। ১৮৭৫ সালে গোথা কংগ্রেসে (Gotha Congress) এই দুই দল তাদের আন্দোলনের দুই ধারাকে মিলিয়ে দিল, আর দুই দল সম্মিলিতভাবে হয়ে দাঁড়াল **সোজিয়ালিসটিস আরবেইটার পারটেই ডয়েসল্যান্ডস** (*Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands*)। যে কর্মসূচি নিয়ে এই সংযুক্তিকরণ ঘটল তাতে মার্ক্সের আপত্তি থাকলেও তা গ্রাহ্য হয়নি। ১৮৯১ সালে এরফুট (Erfurt) কংগ্রেসে এই সংযুক্তদলের নতুন নামকরণ হয়, পুরানো নামের থেকে শুধু আরবেইটার শব্দটি তুলে দেওয়া হয়। এই কংগ্রেসে যে কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল তাতে এঙ্গেলস-এর কিছু কিছু আপত্তি থাকলেও, মোটামুটিভাবে একটি গ্রাহ্য মার্ক্সবাদী কর্মসূচিই গ্রহণ করা হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিতে একটা বড় দিগন্ত খুলে গিয়েছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে। ১৮৬৪ সালের প্রথম ইন্টারন্যাশনালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সদস্যরা এসেছিলেন। এই সংগঠনের নিয়ম

শৃঙ্খলা মার্ক্সই রচনা করে দিয়েছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এর অধিবেশন হয়েছিল। ১৮৬৮ সাল থেকে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রীরা **বাকুনিন** (Bakunin)-এর নেতৃত্বে নৈরাজ্যবাদীদের প্রভাবে পড়েছিল। কিন্তু মার্ক্স নৈরাজ্যবাদ পছন্দ করতেন না। তাই যেমন লাসালের সাথে ঠিক সেইরকম বাকুনিন-এর সাথেও তাঁর বনিবনা হয়নি। ১৮৭২ সালে মার্ক্স বাকুনিনের দলকে ইন্টারন্যাশনাল থেকে বহিষ্কার করে দেন। এই বহিষ্কারের ফলে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল স্তিমিত হয়ে যায় ("with that expulsion, however, the First International lost vitality and it died of inanition after a congress at Geneva in 1874"—Ketelbey)। এরপর দুবার—১৮৮৯ এবং ১৯৯০ সালে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক বা ইন্টারন্যাশনালকে রুশ সমাজতন্ত্রীরা চালু করেছিলেন এবং মস্কোতে (Moscow) এর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালে প্রথমটির মতো কঠোর, রক্ষণশীল ধ্রুপদি মার্ক্সবাদের বিপ্লবী চেহারাকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা। এইভাবে যখন মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র বিশ্ববিপ্লবের পথে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ফ্রান্সে মার্ক্সবাদ প্রতিহত হচ্ছিল **সিন্ডিক্যালবাদের** (Syndicalism) দ্বারা। সিন্ডিক্যালিটরা মার্ক্সবাদীদের মতো শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করত, শুধু তারা মনে করত যে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব এক নতুন স্বৈরাচারের সূচনা করবে। তাতে মানুষের মঙ্গল হবে না। জার্মানিতে দীর্ঘদিন ধরে লাসাল প্রবর্তিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল মার্ক্সবাদী কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি মেনে চলছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে **বার্নস্টেইন**-এর (Bernstein) নেতৃত্বে 'সংশোধনবাদ (Revisionism') এই নামে এক নতুন মতবাদ চালু হয়েছিল যা মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্নতর সমাজতন্ত্রের সূচনা করতে চেয়েছিল। তা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়নি।

রাশিয়া : রাশিয়াতে সরকারের স্বৈরাচার, জারতন্ত্রের ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা দেশের ভেতর যে হতাশার জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যে বিপ্লবী মার্ক্সবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের জঙ্গী মানসিকতা খুব সহজে বেড়ে উঠেছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে **লেনিনের** (Lenin) নেতৃত্বে বলশেভিক দল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান সফল মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রূপায়ণ করে। এই বিপ্লবের পর লেনিন সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন এবং ট্রট্স্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। এর আগে ১৯০৫ সালে একবার বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। উনিশ শতকের শেষ থেকেই রাশিয়াতে বুদ্ধিজীবীদের কারও কারও মানসিকতায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জন্ম হচ্ছিল। এই মানসিকতা ক্রমশ আরও উগ্র হয় এবং সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নিয়েছিল **নিহিলিজম্** (*Nihilism*)। একটি সংহারের দর্শন—প্রচলিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নবীনের উদ্বোধন ঘটানোর বেপরোয়া কর্মসূচি। নিহিলিস্টদের একটি প্রচারপত্রে তাদের উদ্দেশ্যকে এইভাবে বলা হয়েছে— "To found on the ruins of the present social organization the empire of the working classes"—"প্রচলিত সমাজসংগঠনের ধ্বংসের উপর শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্য গড়ে তোলা।" স্পষ্টতই নিহিলিজমের মধ্যে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল। ফলে একে প্রতিরোধ করার জন্য সরকার সর্বশক্তি নিয়ে নেমেছিল। সন্ত্রাস, পীড়ন, কারাবাস, সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, হত্যা, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া—কিছুই বাদ ছিল না। এর প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীরাও সেখানে ধ্বংসের গোপন মারমুখী অভিযানকে শ্বেত-সন্ত্রাসের সমুচিত জবাব ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। এমনকী জারের জীবননাশের চেষ্টা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের কোন চেষ্টাই সফল হতে পারছিল না। অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারতন্ত্রের ব্যর্থতা, জনতার অর্থনৈতিক দুর্দশা, যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে জাতীয় মর্যাদার অবক্ষয়, দেশের অভ্যন্তরে

নিদারুণ খাদ্যাভাব ইত্যাদি অনেক সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে জনরোষকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। জনরোষের শিখরে দাঁড়িয়ে লেনিন (Lenin) আসন্ন বিপ্লবের সঠিক মুহূর্তটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। বলশেভিক দলও ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণের নায়ককে চিনতে ভুল করেনি। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় বিপ্লবের আয়োজনে দল ছিল প্রস্তুত, নেতা উপস্থিত, কর্মসূচি স্থির আর কাল বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটায় সম্যকভাবে আবির্ভূত। দল-নেতা-কাল-কর্মসূচি এই চার উপাদানের অবূতপূর্ব মিলনে রাশিয়ায় সূচিত হল পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক বিপ্লব ও বিজ্ঞানসম্মত মার্ক্সবাদের নিরঙ্কুশ জয়।

১(খ).১১ নৈরাজ্যবাদ

সমাজতন্ত্রের এক চরমপন্থী বিকাশ হল **নৈরাজ্যবাদ** (Anarchism)। **প্রুধোঁ** (১৮০৯-৬৫), **মিখাইল বাকুনিন** (১৮১৪-৭৬), **পিটার ক্রপটকিন্** (১৮৪২-১৯২১) ইত্যাদি দার্শনিকরা ছিলেন এর প্রবক্তা। এই মতবাদ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মানেন, রাষ্ট্র ও সমাজের যে কোন প্রতিষ্ঠান মানুষের স্বাধীন কর্মকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে তাকেই তারা ভেঙে ফেলতে চান। নৈরাজ্যবাদীরা চান রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বদলে স্বাধীন ব্যক্তি মানুষের স্বেচ্ছাপ্রসূত সমবায়ী সমাজব্যবস্থা। নৈরাজ্যবাদের "প্রবক্তারা সমস্ত ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অবিচারের বিরুদ্ধে মৌল প্রতিবাদের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁরা স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের একটা শিথিল সংগঠনে বিশ্বাসী ছিলেন। সেখানে সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, জেলখানা বা লিখিত আইনের কোনও ভূমিকা নেই। তাঁদের মধ্যে কারও বিশ্বাস ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে, কেউ চাইতেন রক্ত ঝরা বিপ্লব।" (**রাজনীতির অভিধান** সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৬০। পঠিতব্য অতীন্দ্রনাথ বসু—**নৈরাজ্যবাদ**)।

১(খ).১২ সরকার ও সমাজতন্ত্রী দল

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে ফ্রান্সে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল তা দু ধরনের রাজনৈতিক মানুষদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। একদিকে ছিল প্রজাতন্ত্রীরা যাদের নেতা ছিলেন **লামারতাঁ** (Lamartine)। এরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা চাইতেন রাজতন্ত্র মুছে যাক, আসুক প্রজাতন্ত্র—জনগণের সরকার। অন্য গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)। তাঁরা প্রজাতন্ত্র চাইতেন কিন্তু প্রজাতন্ত্রই লক্ষ্যের শেষ একথা মানতেন না। তাঁদের কথা ছিল প্রজাতন্ত্র একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের সাময়িক বিরতি, আর সে লক্ষ্য হল সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। লুই ব্লাঁ সরকারে থেকে অর্থনৈতিক বিপ্লব চেয়েছিলেন যেখানে শ্রমিকদের চাকুরি নিশ্চিত হবে, শ্রমিকস্বার্থে আইন প্রণীত হবে এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ সরকারি কর্মসূচিতে বহাল থাকবে। লুই ব্লাঁর চাপে সরকার সমস্ত প্রজার কর্মলাভের অধিকার ('right to employment') মেনে নিয়েছিল এবং জাতীয় কর্মশালা (national workshops) চালু করেছিল। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য লুই ব্লাঁর নেতৃত্বে একটি শ্রমকমিশন ও গঠন করা হয়েছিল।

জার্মানীতে সমাতান্ত্রিকদের বিসমার্কের দ্বারা পরিচালিত সরকারের কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে লড়বার জন্য তিনি তাঁর অন্যতম শত্রু যাজকদলের সঙ্গে আপস করে নিয়েছিলেন। ১৮৭১ সালের পর থেকে সমাজতন্ত্রীরা রাইকস্ট্যাগে (Reichstag) নির্বাচিত হতে শুরু করে। তাদের যে নীতি সমূহের ভিত্তিতে তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত সেগুলিরই সবই ছিল জার্মানির তাবৎ চালু

প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। তারা ছিল গণতান্ত্রিক, জার্মানি ছিল রাজতান্ত্রিক। তারা সকলের জন্য ভোটাধিকার দাবি করত, সে যুগে তা ছিল বিপজ্জনকভাবে বৈপ্লবিক। তারা সমস্ত মানুষের হয়ে কথা বলত, সেযুগের রাজনীতিতে তার প্রচলন ছিল না। তারা রাষ্ট্রতান্ত্রিক কাঠামে যেমন রাজতান্ত্রিক শাসন ও স্বৈরাচারী ক্ষমতা পছন্দ করত না ঠিক সেই রকমভাবে তারা রাষ্ট্রের যুদ্ধবাদ (militaristic) বনিয়াদও পছন্দ করত না। ফলে 'রক্ত ও লৌহ' (Blood and Iron) নীতিতে বিশ্বাসী বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রী দলকে ভেঙে ফেলার সমস্ত রকম চেস্টায় নিজেকে সচেস্ট করেন। এমন আইন তিনি পাশ করলেন যার দ্বারা দলগঠন (societies), বৈঠক (meetings), পুস্তিকাপ্রকাশ (Journals) যার দ্বারা সমাজতন্ত্রের বিকাশ হয় তা বন্ধ করে দিলেন। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন কোথাও গুপ্ত সমিতির আড়ালে চলে গেল, কোথাও বা নাম বদল করে কর্মসূচির ধারাকে গোপন করে ফেলল। ১৮৭১ সালের নির্বাচনে রাইকস্ট্যাগে দুজন সমাজতন্ত্রী নির্বাচিত হযেছিল। ১৮৯০তে এই সংখ্যা বেড়ে হল পঁয়ত্রিশ। ফলে বিসমার্ক তাঁর ক্ষমতায় অবস্থানের শেষ দিকে সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলান এবং তাদের মন জয় করার জন্য নানাবিধ শ্রমিক কল্যাণ আইন চালু করেন। ১৮৮৩, ১৮৮৪ এবং ১৮৮৯ সালে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমার (State Insurance) আইন চালু হয়। কিন্তু বিসমার্ক সমাজতন্ত্রকে দমন করতেও যেমন পারেননি তেমনি সমাজতন্ত্রীদের জয় করাও তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। তিনি যে সমাজতন্ত্র চালু করার চেস্টা করেছিলেন তা হল রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State socialism) যা একজন স্বৈরাচারীর দান। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা চেয়েছিলেন অন্য জিনিস তা হল গণতন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সমাজতন্ত্র (Socialism based on democracy)।

১(খ).১৩ সারাংশ

শিল্প-বিপ্লবের অন্তর্লীন মানবশ্রমের অবাধ শোষণকে প্রতিরোধ করার জন্য সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। তার লক্ষ্য ছিল সার্বিক সমাজ পরিবর্তন, শাসকদের দান কোন বিক্ষিপ্ত সমাজ সংস্কার নিয়ে সমাজতন্ত্র কখনো সন্তুস্ট থাকতে পারেনি। প্রথম দিকের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র পরিবর্তনের কর্মসূচিকে জোরদার করতে পারেনি কারণ প্রারম্ভিক পর্যায়ের চিন্তাধারাতে আবেগের আতিশয্য ছিল, বিজ্ঞান-সম্মত বোধের অভাব ছিল এবং কোন কর্মসূচিকে বহাল করার মতো সংগঠন তখনও গড়ে ওঠেনি। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র মার্ক্সবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলির আবির্ভাবের পর থেকে বাস্তবসম্মতভবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র। ইংল্যান্ডে ওয়েনবাদ ট্রেড ইউনিয়নের পথে গেলেও ফ্রান্সে এবং জার্মানিতে এবং পরে রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়েছিল। জার্মানিতে বিসমার্কের লৌহশাসন আর রাশিয়াতে জারতন্ত্রের সন্ত্রাস এই দুইয়ের মুখোমুখি লড়াই করতে হয়েছিল সেখানকার সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের। জার্মানিতে লাসাল সংগঠিত করেছিলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল আর ফ্রান্সে লুই ব্লাঁ সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রী দলকে ক্ষমতায় আসীন করেছিলেন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে। রাশিয়াতে লেনিন বলশেভিক দলকে বিপ্লবের পথে নিয়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত পৃথিবীর প্রথম ও সর্ববৃহৎ শ্রমিক উত্থানের সাফল্যকে সূচিত করেছিলেন। মার্ক্স বলেছিলেন যে শ্রমজীবী মানুষকে নিজের স্বার্থে বিশ্বময় ঐক্য প্রচেস্টায় সামিল হতে হবে। এইজন্য তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। আর এই ডাককে সার্থক করার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক ঐক্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল।

পরে ১৯১৯ সালে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল এই ঐক্যবোধকে একটি বিপ্লববোধে রূপান্তরিত করে বিশ্বময় বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করল। সমাজতন্ত্রের দর্শন নিজের ভেতর নানা দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের মতো চরমপন্থাকে উপেক্ষা করে শ্রেণী সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পথে প্রলেতারিয়তের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ধারণায় লীন হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র নিপীড়িত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়নি। জার্মানিতে বিসমার্কের মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক ও শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের গুরুত্বকে বুঝতে পেরে তার সঙ্গে আপস করেছেন—State socialism বা রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের ভিন্নতর এক দিগন্তকে খুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপের সমাজতন্ত্রীকে কোন সংস্কার চাননি, চাননি রাষ্ট্রের দান। শক্তিধরের কৃপা আপাতভাবে মধুর হলেও তার মধ্যে দীনতা আছে। পশ্চিমের সমাজতন্ত্র এই দীনতায় লীন হতে চায়নি। নিজের শক্তির দ্বারা শোষককে ধ্বংস করে নিজের কর্মসূচিকে বহাল রাখার যে অঙ্গীকার তাকে সমাজতন্ত্র কোন দিনই পরিহার করেনি। শ্রেণীহীন সমাজকে চোখের সামনে ধরে আবহমান কালের শ্রেণীদ্বন্দ্বকে একটি স্থায়ী পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার অপরাজিত স্বপ্নকে কার্ল মার্ক্স সমাজতন্ত্রীদের দিয়েছিলেন। সে লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র আজও স্থির আর এই স্থির লক্ষ্যে শোষক শোষিতের বিরামহীন সংঘর্ষের দ্বান্দ্বিকতায় ইতিহাস হয়ে আছে দুই বিপরীতের সমন্বয়।

১(খ).১৪ অনুশীলনী

১। একটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) শিল্প-বিপ্লবের সাথে সমাজতন্ত্রবাদের যোগ কী?

(খ) সাম্যবাদ কখন জন্ম নেয়?

(গ) ১৮৪৮ সালের আগে সমাজতন্ত্র কি ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে ভয়ের ও আশঙ্কার কারণ ছিল?

(ঘ) ডেভিড টমসনের বইয়ের নাম কী?

(ঙ) ইউরোপের বাইরে যে নয়া দুনিয়ায় সাম্যবাদ গড়ার স্বপ্ন জেগেছিল সে নয়া দুনিয়া কোথায় ছিল?

(চ) এবে ম্যাব্লি ও এলভেসিয়াস কে ছিলেন?

(ছ) রুশো কে?

(জ) সমাজতন্ত্র কি ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

(ঝ) Utopia বা কল্পলোক কে লিখেছিলেন?

(ঞ) রবার্ট ওয়েনের সময়কাল কী?

(ট) নিউ ল্যানার্ক কেন বিখ্যাত?

(ঠ) কোঁৎ দ্য সেঁ-সিমঁ কী করেছিলেন?

(ড) ফালাস্তার-এর প্রবক্তা কে?

(ঢ) লুই ব্লঁ কোন দেশের মানুষ ছিলেন?

(ণ) সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্বের একটি বৌদ্ধিক রচনার নাম করুন।

(ত) বাবউফ কে?

(থ) সমাজতন্ত্রবাদের এক জঙ্গি প্রবক্তার নাম করুন।

(দ) নুভো ক্রিস্তিয়ানিজম কে লিখেছিলেন?

(ধ) জন লিলবার্ন কোন দলের নেতা ছিলেন?

(ন) লেভেলাররা কী চেয়েছিলেন?

(প) দ্বান্দ্বিকতা কী?

(ফ) কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গোল কোন দেশের মানুষ ছিলেন?

(ব) মূল্যের শ্রমতত্ত্বের মূল কথা কী?

(ভ) ডেভিড রিকার্ডোর থেকে সমাজতন্ত্র কোন ধারণা গ্রহণ করেছিল?

(ম) বার্ট্রান্ড রাসেলের কোন গ্রন্থ আপনার পাঠ্যবিষয়ে উল্লিখিত আছে?

২। চিহ্ন দিয়ে ঠিক [✓] বা ভুল [x] জানান—

(ক) সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল সমাজতন্ত্রী ছিল না। [ ]

(খ) লুই ব্লঁ ফ্রান্সের সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন। [ ]

(গ) বিসমার্ক জার্মানিতে সমাজতন্ত্রকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। [ ]

(ঘ) বিসমার্ক ১৮৮০ দশকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গো আপস করেছিলেন। [ ]

(ঙ) কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো কার্ল মার্ক্সের লেখা নয়। [ ]

(চ) লাসাল মার্ক্সপন্থী ছিলেন। [ ]

(ছ) প্রুধঁ যা প্রচার করতেন তা নৈরাজ্যবাদ। [ ]

(জ) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লেখা আছে। [ ]

(ঝ) অবলোপের অবলোপ সূত্রকে শুধু হেগেলই ব্যবহার করেছেন। [ ]

(ঞ) হেগেলের উল্লম্ফন তত্ত্বকে মার্ক্স সমাজ-বিপ্লবের তত্ত্ব বলে ব্যবহার করেছেন। [ ]

(ট) 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—একটি বই-এর নাম। [ ]

(ঠ) ডাস ক্যাপিটাল একটি স্লোগান। [ ]

(ড) চার্টিস্ট আন্দোলন ফ্রান্সে সংঘঠিত হয়েছিল। [ ]

(ঢ) লুই অগুস্ত ব্লাঁকি একজন জার্মান বিপ্লবী। [ ]

(ণ) কার্বোনারি একটি গুপ্ত সমিতির নাম। [ ]

(ত) নিহিলিজম্ একটি ধ্বংসের দর্শন। [ ]

(থ) সোস্যাল কনট্র্যাক্ট গ্রন্থটির রচয়িতা লুই ব্লাঁ। [ ]

(দ) মার্ক্স সারা জীবন জার্মানিতে বসবাস করেন। [ ]

(ধ) ট্রট্স্কি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। [ ]

(ন) লেনিন বাকুনিনের মতকে প্রতিষ্ঠা করেন। [ ]

৩। দশটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) কার্ল মার্ক্সের অর্থনৈতিক সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(খ) কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(গ) জার্মানিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশের বিসমার্কীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) ইংল্যান্ডের সমাজতন্ত্রবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা কে? তাঁর চিন্তা ও কার্যকলাপ বর্ণনা করুন।

(ঙ) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি আলোচনা করুন।

(চ) সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে লাসাল ও ব্লাঁকির স্থান কোথায়?

(ছ) নৈরাজ্যবাদ কী?

(জ) দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রের অবস্থা কী ছিল?

(ঝ) মার্ক্সবাদের অন্তর্গত শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

(ঞ) লুই ব্লাঁ, অগুস্ত ব্লাঁকি ও বাবউফের তত্ত্ব ও কর্মসূচি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(ট) সমাজতন্ত্রের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের স্থান কোথায়?

(ঠ) সমাজতন্ত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই-এর নাম লিখুন এবং তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(ড) ভাববাদ ও বস্তুবাদের তফাত কী?

(ঢ) দার্শনিক হেগেল সম্বন্ধে একটি আলোচনা করুন।

(ণ) কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের তফাত কী?

১(খ).১৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. H. B. Acton — *The Illusion of the Epoch* (1955) : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও রুশবিপ্লব ও লেনিনের দর্শন জানার জন্য প্রয়োজনীয় বই।

2. Zeredei Barbu — *Democracy and Dictatorship* (1956) : কমিউনিজমের মনস্তাত্ত্বিক দিক বোঝার জন্য উৎকৃষ্ট বই। এতে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা আছে।

3. Max Beer — *Fifty year of International Socialism* (1935) : এর মধ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ইতিহাস আছে।

4. Nicolas, Berdyaev — *The Origin of Russian Communism (1937) – The Russian Idea (1947)*

রুশবিপ্লব ও বলশেভিক চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের প্রতিফলন বোঝার জন্য পঠিতব্য বই। দ্বিতীয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

5. Isaiah Berlin — *Karl Marx* (1939, পুনুর্মুদ্রিত ১৯৪৮) : সংক্ষেপে কার্ল মার্ক্সের একটি প্রামাণ্য জীবনী।

6. Martin Buber — *Paths in Utopia* (1949) : বলা হয়ে থাকে উনিশ শতকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় দুটি মত প্রচলিত ছিল। একটি মত—যার ধারক ও প্রবর্তক ছিলেন প্রুধঁ—একথা বলত যে সমাজকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে। আরেকটি মত—যার প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন মার্ক্স ও লেনিন—বলত যে সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রায়িত হবে। এই দুই মতের ব্যাখ্যা এই বইয়ে আছে।

7. G. D. H. Cole — *A History of Socialist Thought, Vols, I-V* (1954-60) সমাজতন্ত্রের ইতিহাস জানার জন্য অপরিহার্য গ্রন্থরাজি।

8. Benedetto Croce — *Historical Materialism and the Economics of Karl Marx* (1914) ইটালীয় ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত ১৯৯০ সালে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অসাধারণ বিশ্লেষণ।

9. Alexander Gray — *The Socialist Tradition from Moses to Lenin* (1949) : সমাজতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এতে পাওয়া যাবে। প্রাক্-মার্ক্স সমাজতন্ত্র জানার জন্য অপরিহার্য।

10. Hans Kelsen — *The Political Theory of Bolshevism* (1949) রুশ সমাজতন্ত্রের সুন্দর ছোট আলোচনা।

11. John Plamenatz — What is Communism ? (1947)

German Marxism and Russian Communism (1954) এই দুটি গ্রন্থ অবশ্য পঠিতব্য। কমিউনিজম কী, জার্মান মার্ক্সবাদ ও রুশ কমিউনিজমের মধ্যে যোগাযোগ কী তার তথ্যনিষ্ঠ, বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা।

12. Howard Selsam — *Socialism and Ethics* (1943) সমাজতন্ত্র বিষয়ে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

13. David Thomson *The Conspiracy of Babeuf* (1947) সমাতজন্ত্রের বৈপ্লবিক দিকের আলোচনা আছে এই বইয়ে।

উপরে উল্লিখিত এই বইগুলি ছাড়া মূল পাঠ্যবিষয়ে (Text) মাঝে মাঝে যে সব বই-এর উল্লেখ আছে তার সবকটিই পড়তে হবে। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর য়োরোপের ইতিহাস ১৭৮৯-১৯১৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ) অত্যন্ত সুলিখিত পঠিতব্য পুস্তক। এই বইয়ের নবম অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রের বর্ণনা আছে। এছাড়া সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তীর ***ইয়োরোপের ইতিহাস*** (১৭৬৩-১৮৪৮) গ্রন্থের দশম অধ্যায় পড়া যেতে পারে। এটিও একটি সুলিখিত গ্রন্থ।